আলোর কাছাকাছি

অমিয় দাস

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

পিতৃ স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী

কিছু কথা

প্রেম ভালবাসা চিরকালের। চিরকালেই প্রেমে যোগ-বিয়োগ আছে এবং থাকবে। আমার প্রথম গল্পগ্রন্থের গল্প গুলির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। গল্পগুলির পটভূমি একেবারে গাঁ-বাঙলার মাটির মানুষজনদের নিয়ে। উপস্থাপিত গল্পের প্রেরণা মূলতঃ আশ-পাশের দেখা জীবনের চাওয়া পাওয়ার যন্ত্রণার দিকে চেয়েই। যে যন্ত্রণার মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছে বাঁচার প্রেরণা। 'আলোর কাছাকাছি' সেই সব মানুষেরই প্রেম ভালবাসা ও লালসার খণ্ড চিত্র। যে চিত্রে স্থান-কাল পাত্রভেদে আমি—বেছে নিয়েছি গ্রামকেই।

গ্রাম জীবনের সুখ দুঃখের এইসব খণ্ড কাহিনীর পাঠক হিসাবে, আপনার ভাললাগা, না লাগা আপনার নিজস্ব ব্যাপার। ভাল লাগলে নিশ্চয়ই খুশি হোব, সেই সঙ্গে উৎসাহিতও। আমি আমার গল্পের মধ্যে জীবনকে দেখার ও দেখানোরই চেষ্টা করেছি মাত্র। সে দেখার মধ্যে যদি ফাঁক ও ফাঁকি থেকে থাকে, পাঠক হিসাবে নিশ্চয় পত্রাঘাত করে আমার দেখার দৃষ্টিকে আরো স্বচ্ছ করে তুলতে সাহায্য করলে বাধিত হোব।

সবশেষে বলি, ইচ্ছাটা ইচ্ছাতেই থেকে যেত, যদি না তরুণ বন্ধুবর বাসুদেব মোশেলের আন্তরিক সহযোগিতা না পেতাম। বলতে গেলে তাঁরই একান্ত ইচ্ছায় এ গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

বিনীত—

অমিয় দাস

আকাশে সূর্য যখন

এয়োতীর কপালে সিঁদুর বিন্দুর মত আকাশের কপালে লাল টিপ। ডুবে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে। পশ্চিমাকাশের দিগন্তরেখার শেষ প্রান্তের কিছু ওপরে।

চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। গাছের ডালে যত্নে গড়া নীড়ে সারাদিনের ক্ষুধার্ত বাচ্চার মুখে খাদ্য কণা তুলে দেবার জন্য পাখিরা ফিরে চলেছে। পুবাকাশের দিগন্ত রেখায় সিগারেটের ধোঁয়ার মত কুয়াশার গাঢ় আস্তরণ।

একটু দূরে রায়েদের বিল। বিলের জল শান্ত নয়। কই, মাগুর, সিঙ্গি, ল্যাঠা, শাল, শোল, লাফ দিয়ে জলের আস্তরণে ঢেউ তুলছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো বৃত্তাকারে বাড়তে বাড়তে একে অপরকে গ্রাস করছে পরিবির প্রান্তরেখায়। বিলের বুকে ভেসে আছে কলমী, কানচিড়ে আর কিছু কচুরিপানা। শাপলাফুল পাপড়ি গুটিয়ে নতমুখে জলের দিকে তাকিয়ে আছে সাঁঝবেলা কলসীকাঁখে হঠাৎ পরপুরুষের সামনে-পড়ে-যাওয়া লাজবতী বধূর মত।

আকাশে একটা চাঁদকপালে ঘুড়ি। ঘুড়িটা লাট খাচ্ছে। লাট খাচ্ছে বৃন্দাবনের মনও। সে টঙের মধ্যে ছেঁড়া চাদর জড়িয়ে বসে আছে। শব যাত্রীরা যেমন শব আগলে বসে থাকে।

একবন্দে পাঁচবিঘে জমি ইন্দুবাবুর বৃন্দাবনরা ফুরণ নিয়েছে। বিঘেপ্রতি কাটতে পাঁচটা আর তুলতে ছ'টা জন, মোট এগারটা। চার এগার চুয়াল্লিশ, পাঁচ চুয়াল্লিশ……।

মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে যায় বৃন্দাবনের। ইস্ এত টাকা। আবার একসঙ্গে। একমাস আগে একটা টাকার জন্য সে হন্তে হয়ে ঘুরেছে নন্দ মোড়লের পিছনে।

নন্দ খুড়ো একটা টাকা ধার দেবে ?

ক্যানো দোব না ? তবে গোল (গোল বলতে কয়েন) নিয়ে যেন গোল করিসনি বাপু !

না, না। আমি ঠিক শোধ করে দোব। হ্যাঁ শোধ দিলেই ফের পাবে।

কত সুদ ?

সুদ ! কত আর ! এই ধর—বলে নন্দ মোড়ল নস্যি নেয় একটিপ। (নস্যির দাম সবচেয়ে কম, তাই নন্দ মোড়ল কম খরচের নেশাটাই বেছে নিয়েছে।) তারপর বলে তের হপ্তায় শোধ দিতে হবে। প্রত্যেক হপ্তায় দু'আনা করে।

এত সুদ নন্দ খুড়ো : এ যে টাকায় দশ আনা !

কোতায় দশ আনারে ! তোদের গরমেণ্ট দশ আনা হতে দিল কই ' দু আনা মানে বার নয়া। তাহলে বারং তেরং একশো ছাপান্ন ' একশো ছাপান্ন মানে এক টাকা ন'আনা। যেদিন থেকে, গরমেণ্ট নয়া পয়সা চালু করল, সেদিন থেকেই টাকায় এক আনা করে ঠকছি বুজ্‌লি বেন্দা। এমনি করে সতের আঠার বছর ঠকে এসছি—বুজলি। অথচ, দ্যাক্ আমাদের দুক্‌খু কে বুজবে বল।

নন্দ মোড়লের কথা মনে পড়তেই বৃন্দাবনের হাসি পায়। লোকে তাকে সামনে বলে খুড়ো, পিছনে বলে—শালা রক্তচোষা বাদুড়।

মনে পড়ে বৃন্দাবনের অনেককিছু। কী সিজেনটা না গেল। ভুট্টোর টিকলি খেয়ে খেয়ে লোকের পেটে স্যাংলা পড়ে গেল। কণ্ট্রোলে চাল দিত একশো দেড়শো গ্রাম। লোকে কচুর শিকড় তুলে খেতে আরম্ভ করে দিল। দেশে চাল নেই·········বৃন্দাবন ভাবে—হয়ত নেই, হয়তো ছিল। কিন্তু একটা জিনিস অবশ্যই ছিল না। তা হল লোকের হাতে পয়সা।

সেদিন বৃন্দাবন ফিরছিল হাট থেকে। পথে ইন্দু হাজরার সঙ্গে দেখা। ইন্দু বললে, বলি ও বেন্দাবন, জমিটা এট্‌টু দেকো। তুমিই

হেপাজাত করে মা লক্ষীকে ঘরে তুলে দিও !

জেটা বাবু ফুৎণে তুলে দোব। আর একটা টঙ ফেলতে হবে।

হ্যাঁ বাবা ঠিক বলেচ। বড্ডো নাকি ধান চুরি হচ্চে।

হ্যাঁ, অনেকে তো অনেক দিন ভাত খায়নে। তাই ধানের শীষ ছেঁটে নে যাচ্চে। বৃন্দাবন উত্তর দেয়।

হাড় কাঁপিয়ে দেওয়া শীত পড়েছে। মাঠ থেকে জনেরা চলে গেছে সূর্য ডোবার আগেই। দূরে কাছে দু একটা টঙ পড়েছে। ইন্দু হাজরার জমিতে টঙ ফেলেছে বৃন্দাবন। হাঁদু হাটে গেছে চা আর গুড় কিনতে। এল বলে। এলেই ওরা দুজনে র-চা বানিয়ে ইন্দু হাজরার পাঠিয়ে—দেওয়া রুটি তরকারি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

কেউ কোথাও নেই। গোধূলির মৃতুলগ্নে জন্ম নেবে সন্ধ্যা। তখন মাঠ বড় নির্জন। দূরে শ্মশানের ধারে শেয়ালের দল ডেকে ওঠে—হুয়া-কাকা—হুক্কা হুয়া··। বড় একা লাগছে বৃন্দাবনের।

দূরে—আরও দূরে—কে যেন আসছে। মাথায় এক রাশ নাড়া। সারা শরীরটা গামছা রঙের লাল শাড়ীতে জড়ানো। গতি অলস মন্থর।

খড়ের বিচালী দিয়ে তৈরী দোচালা টঙের মধ্যে বসে বৃন্দাবন টর্চের আলোর মত তার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে সেই লাল শাড়ি জড়ানো শরীরটার ওপর ফোকাস করে। স্পষ্ট হয়ে আসে শরীরটা।

হারানী না !

সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে। রক্তের ঢেউ আছাড় খেয়ে এসে পড়েছে হাতের মুঠোর-আকারের বুকের খাঁচার মধ্যে বসান ছোট সোনাফলটাতে। আকারেঐটুকু—কত ধাক্কা আর সে সামলাবে।

বর্ষায় নালার ধারে শিকারের আশায় ওৎ পেতে থাকা ঢোঁড়া সাপের মত তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে বৃন্দাবন টঙের মধ্যে। হারাণীকে ঐ টঙের পাশ দিয়ে যেতে হবে।